রবীন্দ্র-দর্শন

প্রভাসকুমার রায়*

বাংলা বিভাগ, মহিষাদল রাজ কলেজ
মহিষাদল, পশ্চিমবঙ্গ, ৭২১৬২৮, ভারত।
***Email:** prabhas62roy@gmail.com

রবীন্দ্রনাথ এক বিশ্ব-বীক্ষা। তাঁর জীবনের সত্তার সঙ্গে মিশে আছে বিশ্ব-মনস্কতার ছাপ। তাঁর চিন্তন ও মনন কখনোই কেবল বাঙালিত্বের সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না; এমনকী তাঁর চিন্তার আলোকজ্যোতি ভারতবর্ষের মাটি ছাড়িয়ে সমগ্র বিশ্বের মানব-কল্যাণে ছড়িয়ে পড়েছিল। তিনি ছিলেন এক বিশ্ব-মানবতাবাদী কবি। সারাজীবন তিনি বিশ্বের মানুষকে ভালোবেসেছেন, তাঁদের দুঃখে তাঁর অন্তরাত্মা কেঁদে উঠেছে। তাঁর লেখনীতে বিশ্বলোকের মঙ্গলবার্তা ধ্বনিত হয়েছে বলেই তিনি হয়ে উঠেছেন সকলের 'বিশ্বকবি'। তিনি কেবল একজন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কবি তা নন, বিশ্ববাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষা ও প্রাণের সুরও তাঁর কাব্য-গীতির মধ্য দিয়ে বারে বারে বেজে উঠেছে। তাঁর এই বিশ্ব-মনস্কতা, বিশ্ব-মানব প্রেম, পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ববোধ ও ঋষিকল্প চিন্তা-ভাবনার উৎস-মুখ নিহিত রয়েছে তাঁর জীবন-দর্শনের মধ্যে। তাঁর এই জীবন-দর্শনের ভিত একদিনে গড়ে ওঠেনি, তা গড়ে উঠেছে সমগ্র জীবন-চর্যার সাধনায়। রবীন্দ্র-জীবন-দর্শন বিশ্বাসের গভীর শিকড় থেকে উত্থিত। তাই সত্য-দর্শনই রবীন্দ্র- দর্শন।

রবীন্দ্রনাথের যে বিশ্ব-মানবিক জীবন-দর্শন, তা তাঁর অধ্যাত্ম-চেতনা থেকে উৎসারিত। আর তিনি এই অধ্যাত্ম-প্রেরণা পেয়েছেন তাঁর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কাছ থেকে এবং পরবর্তী কালে তা আরও বেশি গভীর ও ব্যাপ্তিলাভ করে উপনিষদ ও বৈষ্ণব-ভাবাদর্শের প্রভাবে। ঠাকুরবাড়ির পরিবেশ ও কালচার রবীন্দ্র-জীবন-দর্শন গঠনে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল। দেবেন্দ্রনাথ জমিদার হয়েও তাঁর সন্তানদের বিলাসিতার মধ্য দিয়ে মানুষ করেননি। তাই সাধারণ মানুষদের মত কষ্ট-সহিষ্ণুতা আয়ত্ত করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। স্কুলের ধরা-বাধা নিয়মের পড়াশুনা না করলেও তার জন্য দেবেন্দ্রনাথ চিন্তিত হননি; কেননা বাড়িতে বিভিন্ন বিষয়ে নিয়মিত গৃহ-শিক্ষকের কাছে পড়াশোনা করতেন রবীন্দ্রনাথ। শুধু তাই নয়, শরীরকে ঠিক রাখার জন্য ভোরে উঠে ধুলো-কাদার মধ্যে খালি গায়ে কুস্তি শিখতে হত। এভাবেই রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলা কেটেছে ছন্দে-বাধা রুটিন ধরে।

রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন ধরে অজস্র কবিতা-গান-গল্প-প্রবন্ধ-উপন্যাস-নাটক লিখেছেন। সাহিত্যের সকল শাখায়ই ছিল তাঁর অবাধ বিচরণ। আমাদের বিস্মিত হতে হয় যে, একটাই জীবনে তিনি এত সব কীভাবে লিখলেন? তাঁর জীবনখানি ছন্দোময় ও সুশোভন ছিল বলেই তিনি এত বেশি সাহিত্য-চর্চা করতে পেরেছেন। এই ছন্দোময় জীবন তিনি কীভাবে আয়ত্ত করলেন? এই উত্তরের মধ্যেই নিহিত আছে তাঁর জীবন-দর্শনের স্বরূপ ও ঠাকুরবাড়ির কালচার।

শৈশব থেকেই রবীন্দ্রনাথ পিতার নির্দেশিত পথে চলতেন। পিতার নির্দেশিত শৈশবের কিছু অভ্যাস তাঁর বাকি জীবনকে বিশেষভাবে রেখাপাত করেছিল। যেমন – হিমালয়ে নিয়ে গেলে দেবেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথকে খুব ভোরে ডেকে তুলতেন এবং ঠাণ্ডাজলে স্নান করে আসতে বলতেন। তারপর সূর্য ওঠার আগে ব্রহ্ম-মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে উপাসনা করতেন। ভোরে ওঠা বালক রবীন্দ্রনাথের কাছে অসহ্য হলেও তিনি এটিকে পরবর্তীকালে অভ্যাসে পরিণত করেছিলেন। তাই দেখি, তিনি সারাজীবন ধরে খুব ভোরেবেলা ঘুম থেকে উঠে নিদ্রামগ্ন প্রকৃতির কোলে বসে ঈশ্বরের উপাসনা করতেন। এই সময়ে তিনি নিজের 'ছোটো আমি'র খোলস ত্যাগ করে 'বড়ো আমি'তে সহজেই রূপান্তরিত হয়ে যেতে পারতেন এবং 'শান্তম্' মন্ত্রের উচ্চারণের মধ্য দিয়ে তিনি শোক-তাপ-রাগ-ক্ষোভ প্রভৃতি তুচ্ছ-পৃথিবীর ঊর্ধ্বে উঠে জগৎ-সংসারের কল্যাণময়রূপকে প্রত্যক্ষ করতেন। এই সময়ে তিনি সীমার জগৎ ছেড়ে অসীমের সঙ্গে মিলিত হতেন। প্রতিদিন ভোরবেলা ঘুম থেকে ওঠার অভ্যাস যদি তাঁর পিতা না করাতেন, তাহলে তিনি কোনোদিন ব্রহ্ম-মুহূর্তের এমন অপরূপ রূপ চাক্ষুষ করতে পারতেন না। এজন্য তিনি পিতার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

বালক রবীন্দ্রনাথের যখন উপনয়ন হয়, তখন তাঁকে প্রতিজ্ঞা করতে হয়েছিল যে , তিনি কোনোদিন দিনের বেলা ঘুমোবেন না। বাল্যকাল থেকেই তিনি এই বদ-অভ্যাসটি পরিত্যাগ করেছিলেন বলে পরবর্তীকালে আর তাঁকে দিনে না ঘুমোবার জন্য আপশোশ করতে হয়নি। যারা দিনে ঘুমোতেন, রবীন্দ্রনাথ তাদের তীব্রভাবে অপছন্দ করতেন। বরং তিনি বলতেন যে, যারা দিনে ঘুমোয়, তারা অর্ধেক জীবনটাই ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেয়, এই পৃথিবীর রূপ-রস-সৌন্দর্যের বৈচিত্র্য তারা কখনও অনুভব করতে পারে না। এভাবেই ঠাকুরবাড়ির নিয়ম-কানুন শৃঙ্খলার সঙ্গে পালন করেছিলেন বলেই তাঁর জীবনটি গড়ে উঠেছিল ছন্দায়িতভাবে। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই রবীন্দ্রনাথের ছন্দোময় জীবনের দর্শণও হয়ে উঠবে মূল্যবোধ-সম্পন্ন ও আদর্শায়িত।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কোনোদিন সন্ন্যাস নেননি। সংসার-ধর্ম পালন করেও 'মহর্ষি' উপাধি পেয়েছিলেন। সত্যের প্রতি তাঁর ছিল অবিচল নিষ্ঠা। বিশেষকরে উপনিষদের একটি মন্ত্রের দ্বারা তিনি খুবই অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। সেই মন্ত্রটির দ্বারা তিনি তাঁর জীবনকে পরিচালিত করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথকেও করেছিলেন সেই মন্ত্রে দীক্ষিত। সেই মন্ত্রটি হলো –

"ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ,

তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্।"[১]

পিতার মতো রবীন্দ্রনাথও এই মন্ত্রটির ভাব-মাহাত্ম্য নিজের জীবনে প্রয়োগ করেছেন। এই মন্ত্রটির বাংলা অর্থ হলো – 'ঈশ্বরের দ্বারা সমস্ত জগৎকে আচ্ছাদিত করো, ত্যাগের দ্বারা ভোগ করো, কারও ধনে লোভ কোরো না।' 'ত্যাগের দ্বারা ভোগ' – কথাটির তাৎপর্য হলো – ভোগ যখন করব, তখনও ভোগের বস্তু সম্বন্ধে আসক্ত হয়ে পড়ব না। আসক্তি যদি না থাকে, তাহলে যে কোনো বস্তুকে যেকোনো মুহূর্তে ত্যাগ করা সম্ভব। পরের ধনে লোভ ও নিজের ধনে আসক্তি পরিহার করতে হবে। এটি বড় সহজ সাধ্য নয়। তবে নিজের মনকে তথা জগৎ-সংসারকে ঈশ্বরের দ্বারা যদি আচ্ছন্ন করা যায়, কেবলমাত্র তখনই ত্যাগের মাধ্যমে ভোগ করা সম্ভব। রবীন্দ্রনাথ প্রতিদিন ভোরবেলা উঠে ব্রহ্মমুহূর্তে জগৎ-ব্রহ্মের কাছে এই প্রার্থনাই করতেন, যাতে তিনি বিষয়-বাসনা থেকে দূরে থাকতে পারেন, মনকে নিরাসক্ত, পবিত্র ও নির্মল রাখতে পারেন। তিনি শুধু একজন বড়ো কবিই নন, তিনি একজন উদার-চেতা বিশ্ব-মানবিক সম্পন্ন বড়ো মনের মানুষও বটে। তিনি উপনিষদের থেকে নিরাসক্ত হওয়া ও লোভকে সংবরণ করার শিক্ষা নিয়েছিলেন, ব্রাহ্মধর্ম থেকে জগৎ-পিতার স্বরূপকে অনুভব করতে পেরেছিলেন, আর বৈষ্ণব-ধর্ম থেকে পেয়েছিলেন মানুষকে ভালোবাসার শিক্ষা। এভাবে উপনিষদ, ব্রাহ্মধর্ম ও বৈষ্ণব ধর্মের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছিল রবীন্দ্র-জীবন-দর্শন।

রবীন্দ্র-জীবন-দর্শনের ভিত বড়োই মজবুত—তা মানবিকতা ও আধ্যাত্মিকতার ভাব-সমন্বয়ে গঠিত। তবে তাঁর অধ্যাত্ম-চিন্তা প্রচলিত সাধু সন্ন্যাসীদের আধ্যাত্মিকতা থেকে স্বতন্ত্র ছিল। এর জন্য সন্ন্যাস নেবার কিংবা তীর্থে তীর্থে ঘুরবার প্রয়োজন নেই। তাই তিনি সহজেই বলতে পেরেছেন,

'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।

অসংখ্য বন্ধন-মাঝে মহানন্দময়

লভিব মুক্তির স্বাদ;'[২]

রুদ্ধদ্বারে দেবালয়ের কোণে বসে জপতপ নয়, মানুষের মধ্যে থেকেই পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে ভালোবাসতে চেয়েছিলেন। এভাবে রবীন্দ্রনাথ 'জীবে প্রেম'- এর মধ্য দিয়ে প্রকারান্তরে ভগবানের সেবা করতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের এমন অভিনব ও মানবিক জীবনদর্শন বাস্তবিক আমাদের মুগ্ধ করে তোলে। মানুষের ভালোবাসায় যে পৃথিবী এত সুন্দর, সেই পৃথিবী ছেড়ে যেতে তিনি চাননি কখনও। পৃথিবীর মানুষকে তিনি ভালোবাসতে পেরেছিলেন বলেই মহামানবের মতো প্রত্যয়ের সঙ্গে বলতে পেরেছিলেন—

'মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।'[৩]

আসলে রবীন্দ্রনাথ মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন, মানুষের মধ্যেই রয়েছে দুটি সত্তা – একটি সৎ প্রবৃত্তি, আরেকটি অসৎ-প্রবৃত্তি। রবীন্দ্রনাথ সৎ-প্রবৃত্তিকে বলেছেন 'বড়ো আমি', আর অসৎ-প্রবৃত্তিকে বলেছেন 'ছোটো আমি'। 'ছোটো আমি'র মধ্যে থাকে রাগ-দ্বেষ-হিংসা-রিপু প্রভৃতি তুচ্ছ ও সংকীর্ণ ভাবনা। আর বড়ো আমি'র মধ্যে থাকে নিঃস্বার্থ-পরতা, উদার-মানবতা বোধ ও সকলের মঙ্গলময় চিন্তা। রবীন্দ্রনাথ নিয়তই সাধনা করতেন 'ছোটো আমি' থেকে 'বড়ো আমি'তে পৌঁছাতে। 'বড়ো আমি'তে পৌঁছাতে পারতেন বলেই রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন ধরে মানুষকে ভালোবাসতে পেরেছেন, মানুষকে ভালোবাসার কথা বলেছেন, জগৎ -ব্রহ্মের পরম রূপকে অনুভব করতে পেরেছেন, পিতা রূপে অনুধ্যান করেছেন, আবার কখনো বা 'প্রিয়া' রূপে তাঁর সঙ্গে লীলা করেছেন, কাছে ডেকেছেন। বৈষ্ণব পদাবলিতে যেমন রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলার মধ্য দিয়ে জীবাত্মা-পরমাত্মার মানস-অভিসারকে রূপক হিসেবে দেখানো হয়েছে; তদ্রূপ রবীন্দ্রনাথও 'জীবনদেবতা' বা 'লীলাসঙ্গিনী'র সঙ্গে করেছেন মানস-অভিসার। 'গীতাঞ্জলি' কাব্য তারই ফলশ্রুতি। বলাবাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ যদি 'বড়ো আমি'তে পৌঁছাতে না পারতেন, তাহলে তাঁর পক্ষে কখনোই 'গীতাঞ্জলি' কাব্য লেখা সম্ভব হ'ত না; তিনিও মর্ত্যলোকের খোলস ত্যাগ করে ঈশ্বরের পাদপদ্মে নিজেকে উৎসর্গ করতে পারতেন না।

যেহেতু রবীন্দ্রনাথের এই 'বড়ো আমি'র মধ্যে মিশে আছে নিঃস্বার্থপরতা ও উদার মানবতাবোধ, সেহেতু তা রবীন্দ্র-অধ্যাত্মবাদের সমতুল। কারণ 'বড়ো আমি'র মধ্য দিয়েই রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের সকল মানুষকে ভালোবাসতে পেরেছিলেন, তাঁর 'শান্তির ললিতবাণী' বিশ্বের সকল মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, যার মধ্য

দিয়ে তাঁর বিশ্ব-মনস্কতার মনোভাব দ্যোতিত হয়েছিল। আবার মানুষকে ভালোবাসার মধ্য দিয়েই তিনি ঈশ্বরকে পেতে চেয়েছিলেন,—'জীবে প্রেম করে যেইজন/সেইজন সেবিছে ঈশ্বর' – বিবেকানন্দের এই মর্মবাণী রবীন্দ্রনাথ নিজের জীবনে পালন করতেন। এভাবেই রবীন্দ্রনাথের পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ববোধ, বিশ্ব-মানবতাবোধ ও অধ্যাত্ম-চিন্তা 'বড়ো আমি'র জগৎ থেকেই আলোর দ্যুতির মতো উৎসারিত হয়েছে। সারাজীবন 'বড়ো আমি'র সাধনা করেছিলেন বলেই তাঁর জীবনখানিও হয়ে উঠেছিল সুন্দর ও ছন্দোময়। এরূপ ছন্দোময় জীবন আয়ত্ত করেছিলেন বলেই তিনি একটাই জীবনে পাহাড় প্রমাণ সাহিত্য-নিদর্শন রাখতে পেরেছেন। তাঁর সাহিত্যসামগ্রী যেমন উৎকৃষ্ট, তেমনি তাঁর জীবন ও জীবন-দর্শনও মহিমময়।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন পুণ্য জ্যোতির্ময়স্বরূপ এক বিশ্বমনস্ক আন্তজার্তিক ব্যক্তিত্ব। তাঁর নশ্বরদেহ আর নেই; কিন্তু আছে তাঁর কীর্তি, আছে জীবন-দর্শন। তাঁর সাহিত্য আমাদের অবসাদ-ক্লিষ্ট মনের শান্তির উৎস, তাঁর জীবন-দর্শন আমাদের লক্ষ্যহীন অন্ধকার জীবনের আলোর দিশারী। দুঃখ-জর্জর হতাশাগ্রস্ত বাঙালিকে যথার্থ মনুষ্যত্ববোধে উত্তীর্ণ হতে প্রেরণা জাগাতে পারে রবীন্দ্র–দর্শন। কেননা রবীন্দ্রনাথ আমাদের দেখিয়েছেন—'কীভাবে আমরা বাঁচবো।' তিনি শিখিয়েছেন কীভাবে জীবনকে ছন্দোময় করে তুলতে হয়। তিনি আমাদের শিখিয়েছেন, কীভাবে মৃত্যু-শোককে ভুলে থাকতে হয়, কীভাবে নিরাসক্ত ও নির্লোভ হতে হয়, কীভাবে সঙ্কীর্ণ স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে মানুষকে ভালোবাসতে হয়, কীভাবে ঈশ্বরের সাধনা করতে হয় এবং সর্বোপরি তিনি শিখিয়েছেন কীভাবে শান্তিতে ভালো থাকা যায়। তাই রবীন্দ্র-জীবন-দর্শনই হয়ে উঠুক আমাদের সকলের পাথেয়।

তথ্যসূত্র:

১ । ১ নং শ্লোক। ২০১২। ঈশোপনিষদ। তুলসী প্রকাশনী। পৃষ্ঠা ২১।

২ । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৩৯৫ বঙ্গাব্দ। 'মুক্তি' কবিতা। নৈবেদ্য। বিশ্বভারতী। পৃষ্ঠা ৩৮ ।

৩ । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৩৯৫ বঙ্গাব্দ। 'প্রাণ' কবিতা। কড়ি ও কোমল। বিশ্বভারতী। পৃষ্ঠা ৩৬।